কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায়: পরিচিতি, উৎস ও গুরুত্ব

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১. ২. ৪. ২. ৩. মুতাওয়াতির বনাম আহাদ হাদীস

এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, তা হলো, বর্ণনাকারীদের সংখ্যা। বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক থেকে মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীসকে ভাগ করেছেন: (১) মুতাওয়াতির ও (২) আহাদ।

(১) যে হাদীস সাহাবীগণের যুগ থেকে সংকলন পর্যন্ত সকল স্তরে অনেক রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মুতাওয়াতির বা অতি-প্রসিদ্ধ হাদীস বলে। অর্থাৎ যে হাদীস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক সাহাবী থেকে অনেক তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেক তাবিয়ী থেকে অনেক তাবি-তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সংকলন পর্যন্ত প্রত্যেক পর্যায়ে বহু সংখ্যক ব্যক্তি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়। কোনো যুগেই এতগুলি মানুষের একত্রিত হয়ে মিথ্যা কথা বানানোর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। যেমন সালাতের ওয়াক্ত ও রাকা‘আত সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়।

(২) যে হাদীসকে সাহাবীগণের যুগ থেকে সংকলন পর্যন্ত কোনো যুগে অল্প কয়েকজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে ‘আহাদ’ বা খাবারুল ওয়াহিদ হাদীস বলা হয়।

খাবারুল ওয়াহিদ হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) গরীব: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো এক পর্যায়ে মাত্র একজন রাবী বা বর্ণনাকারী রয়েছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

(খ) আযীয: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো পর্যায়ে মাত্র দুজন রাবী রয়েছেন সে হাদীসকে আযীয হাদীস বলা হয়।

(গ) মুসতাফীয: যে হাদীসের রাবীর সংখ্যা সকল পর্যায়ে দুজনের বেশি, তবে অনেক নয় সে হাদীসকে মুসতাফীয হাদীস বলা হয়।

মুসতাফীয হাদীসকে মাশহূর হাদীসও বলা হয়। অনেক মুহাদ্দিসের মতে যে হাদীস সাহাবীগণের যুগে দু-একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাবিয়ীগণের বা তাবি-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে তাকে মাশহূর হাদীস বলা হয়।[1]

মুতাওয়াতির বা ‘অতি-প্রসিদ্ধ’ হাদীস দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান বা ‘‘ইলম কাত‘য়ী’ (العلم القطعي) এবং ‘দৃঢ় বিশ্বাস’ বা ‘ইয়াকীন’ (اليقين) লাভ করা যায়। কুরআন কারীমের পাশাপাশি এই প্রকারের হাদীসই মূলত ‘আকীদা’র ভিত্তি। এই প্রকারের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অস্বীকার করলে তা ধর্মত্যাগ বা অবিশ্বাস (কুফরী) বলে বিবেচিত হয়।

মাশহুর বা প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান (علم الطمأنية) লাভ করা যায়। এরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অস্বীকার করলে তা পাপ ও বিভ্রান্তি বলে গণ্য। খাবারুল ওয়াহিদ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীসও আকীদার বিষয়ে গৃহীত। তবে সাধারণভাবে ফকীহগণের নিকট খাবারুল ওয়াহিত সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। বরং তা কার্যকর ধারণা (الظن العملي) প্রদান করে। কর্মের ক্ষেত্রে বা কর্ম বিষয়ক হালাল, হারাম ইত্যাদি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে এরূপ হাদীসের উপরে নির্ভর করা হয়। আকীদার মূল বিষয় প্রমাণের জন্য সাধারণত এরূপ হাদীসের উপর নির্ভর করা হয় না। তবে মূল বিষয়ের ব্যাখ্যায় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার উপর নির্ভর করা হয়।[2]

অনেক আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, সহীহ হাদীস যদি ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ হয় এবং তা তাবিয়ীগণের যুগে না হলেও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে তবে ‘আকীদা’র ক্ষেত্রে তার নির্ভর করা যাবে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, বুখারী এবং মুসলিম উভয়ের সংকলিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ এগুলিকে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেহেতু এগুলি দ্বারা সুনিশ্চিত বিশ্বাস লাভ করা সম্ভব। তবে সাধারণভাবে অধিকাংশ আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ পর্যায়ের সহীহ হাদীস ‘ধারণা’ বা ‘কার্যকরী ধারণা’ প্রদান করে, সুনিশ্চিত বিশ্বাস প্রদান করে না।

এ বিষয়ে ইমাম নববী (৬৭৬ হি) বলেন: ‘‘সহীহ হাদীস বিভিন্ন প্রকারের। সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহীহ হাদীস যা বুখারী ও মুসলিম উভয়েই সহীহ বলে উদ্ধৃত করেছেন। এরপর যা শুধু বুখারী সংকলন করেছেন, এরপর যা কেবল মুসলিম সংকলন করেছেন, এরপর যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ের শর্ত অনুসারে সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা বুখারীর শর্ত অনুসারে সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা অন্যদের বিচারে সহীহ বলে গণ্য। শাইখ তাকীউদ্দীন ইবনুস সালাহ (৪৬৩ হি) উল্লেখ করেছেন যে, বুখারী ও মুসলিম অথবা উভয়ের একজন যে হাদীসকে সহীহ হিসেবে সংকলন করেছেন সে হাদীসটি সুনিশ্চিতরূপেই সহীহ এবং তদ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। মুহাক্কিক বা সুপন্ডিত গবেষকগণ এবং অধিকাংশ আলিম তাঁর এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মুতাওয়াতির পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত সকল প্রকারের সহীহ হাদীস দ্বারাই ‘ধারণা’ (ظن) লাভ করা যায়।’’[3]

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কর্মধারা থেকে স্পষ্ট হয় যে, যে সকল হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা সবই আকীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। উপরে আমরা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও ইমাম তাহাবী (রাহ)-এর বক্তব্য থেকে জেনেছি যে, আকীদার বিষয়েও তাঁরা সহীহ হাদীসের উপরে নির্ভর করতেন, এ বিষয়ক হাদীস মুতাওয়াতির হতে হবে তা শর্ত করেননি। পার্থক্য এই যে, কুরআনে উল্লেখিত বা মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত কোনো বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফরী বলে গণ্য হয়। আর খাবারুল ওয়াহিদের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত বিষয় অস্বীকার করলে তা বিভ্রান্তি বলে গণ্য হয়।

আকীদার ক্ষেত্রে ‘মুতাওয়াতির’ হাদীসের উপর গুরুত্ব প্রদানের দ্বিবিধ কারণ রয়েছে:

(ক) হাদীসের এ শ্রেণীভাগ বুঝতে নিম্নের উদাহরণটি আলোচনা করা যায়। যে কোনো বিচারালয়ে উত্থাপিত মামলায় প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে বিচারক একটি দৃঢ় ‘ধারণা’ (ظن) লাভ করেন। তিনি মোটামুটি বুঝতে পারেন যে এ সম্পদ সত্যই এ লোকের বলেই মনে হয় অথবা এ লোকাটি সত্যই এ হত্যাকান্ডে জাড়িত ছিল বলে বুঝা যায়। তিনি এও জানেন যে, তার এই ‘ধারণা’র মধ্যে ভুল হতে পারে। সকল বিচারকেরই কিছু রায় ভুল হয়। কিন্তু এ জন্য বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পন্ন বিচারের রায় প্রদান বন্ধ রাখা হয় না। অনুরূপভাবে সামগ্রিক

সনদ বিচার ও অর্থ যাচাইয়ের পরে ‘খাবরুল ওয়াহিদ’ বা ‘এককভাবে বর্ণিত’ সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস অনুরূপ ‘কার্যকরী ধারণা’ লাভ করেন যে, কথাটি সত্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন। তবে বর্ণনার মধ্যে সামান্য হেরফের থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনা তিনি অস্বীকার করেন না। তবে সম্ভাবনা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একে কার্যত নির্ভুল বলে গণ্য করা হয়। যখন এরূপ বর্ণনা ‘অতি-প্রসিদ্ধ’ (মুতাওয়াতির) বা ‘প্রসিদ্ধ’ (মাশহূর) পর্যায়ের হয় তখন ভুল-ভ্রান্তির সামান্য সম্ভাবনাও রহিত হয়।

কুরআন পুরোপুরিই ‘মুতাওয়াতির’ভাবে বর্ণিত। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপরে তা অবতীর্ণ হয়েছে অবিকল সেভাবেই শতশত সাহাবী তা লিখিত ও মৌখিকভাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের থেকে হাজার হাজার তাবিয়ী তা সেভাবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রচার করেছেন। কেউ একটি শব্দকে সমার্থক কোনো শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করেননি। সহীহ হাদীস তদ্রূপ নয়। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণ অর্থের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখতেন। আরবী ভাষা ও বর্ণনাশৈলীর বিষয়ে অভিজ্ঞ সাহাবী-তাবিয়ীগণ প্রয়োজনে একটি শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন। মূল হাদীসের অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তনের প্রচলন তাদের মধ্যে ছিল।[4]

(খ) আকীদা বা বিশ্বাস মূলত প্রতিটি মুসলমানের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন হতে হয়। বিশুদ্ধ আকীদা ও আমল শেখাতেই আল্লাহ নবী রাসূল প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মতকে বিশুদ্ধতম আকীদা ও আমল শিখিয়ে গিয়েছেন। আমলের ক্ষেত্রে বিকল্প আছে। সব মুসলিমের উপর ফরয কিছু কাজ ব্যতীত বিভিন্ন ফযীলত মূলক নেক কাজে একটি না করলে অন্যটি করা যায়। কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প নেই। আকীদা সবার জন্য একই রূপে সর্বপ্রথম ফরয। যে বিষয়টি বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য প্রয়োজন সেই বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সকল সাহাবীকে জানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেই জানিয়েছেন এবং সাহাবীগণও এভাবে তাবিয়ীগণকে জানিয়েছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, আকীদার বিষয়ে হয় কুরআনে স্পষ্ট আয়াত থাকবে, অথবা অগণিত সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত থাকবে।

এ ছাড়া কর্মের বিষয়ে ‘ইজতিহাদ’ বা কিয়াসের উপরে নির্ভর করা যায়। বিশ্বাসের ভিত্তি ‘গাইবী’ বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয় ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ইজতিহাদ অচল। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ওহীর বিষয়কে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়, তবে যুক্তি দিয়ে নতুন কিছু সাব্যস্ত করা যায় না।

ফুটনোট

[1] সাখাবী, ফাতহুল মুগীস ৩/২৮-৩৫; ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রাহমান আ’যামী, মু’জামু মুসতালাহাতিল হাদীস, পৃ. ১৪-১৬।
[2] রাহমাতুল্লাহ কিরানবী, ইযহারুল হক্ক ৩/৯২০।
[3] নববী, আত-তাকরীব, পৃ. ১।
[4] প্রাগুক্ত ৩/৯২০-৯২১।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13588

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন